Study Material for Semester- Vi
Paper – International Relation after 2nd World War
Given By- Suvendu Saha, (Assistant Prof) Dept. of Histortу,

Bidhan Chandra College, Asansol

তৃতীয় বিশ্বের আঞ্চলিক সংগঠন : SAARC

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী অধ্যায়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে যে পরিবর্তন এসেছিল তাতে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির সামনে অর্থনৈতিক সমস্যা ছিল খুবই কঠিন সমস্যা। অর্থনৈতিক স্বার্থে তৃতীয় বিশ্বের দেশ গুলি আঞ্চলিক সংগঠন স্থাপনের দিকে বিশেষভাবে নজর দিয়েছিল । এ ধরনের দুটি উল্লেখযোগ্য সংগঠন হল – Association of South East Asian Nations বা ASEAN এবং অন্যটি হল- South East Asian Association for Regional Co-operation বা SAARC ।

SAARC

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বহু দেশ স্বাধীনতা পায় এই সদ্য স্বাধীন দেশ গুলির সামনে উন্নয়নের জন্য নানা সমস্যা ছিল। এই সব সমস্যার মধ্যে প্রধান হল জনসংখ্যার আধিক্য, প্রযুক্তি বা কৃৎকৌশলের অভাব, দক্ষ শ্রমিকের অভাব, মুদ্রাস্ফিতি-জনিত সংকট ইত্যাদি। এই সব সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজন ছিল উন্নত দেশগুলির সাহায্য, কিন্তু সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত অনেক দেশই উন্নত দেশগুলির কোন শিবিরেই যোগদান করেনি। তারা নিজস্ব এক বলয় – যাকে জোট নিরপেক্ষতা বলা হয় তাকে অনুসরণ করেছিল। জোট নিরপেক্ষ দেশগুলি নিজেদের মধ্যে আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিল।

সত্তর দশকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে আঞ্চলিক সহযোগিতার উপর জোর দিয়েছিলেন। ১৯৭৯ সালে শ্রীলঙ্কা সফরের সময়ে তিনি দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোকে নিয়ে একটি সংস্থা গঠনের জন্য উদ্যোগী হন। তিনি আসিয়ান বা ইউরোপিয়ান কমিউনিটির মতো একটি আঞ্চলিক সংস্থা গঠনের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ১৯৮০ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ এশিয়াতে কোন আঞ্চলিক সহযোগিতার উদ্যোগ ছিল না। অবশেষে ১৯৮৫ সালের ৯ ই ডিসেম্বের বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরে দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশ SAARC বা South East Asian

Association for Regional Co-operation নামে একটি সংস্থা গঠন করেছিল। এই সাতটি দেশ হল – ভারতবর্ষ, বাংলাদেশ, নেপাল, পাকিস্থান, শ্রীলঙ্কা, ভুটান এবং মালদ্বীপ। এই সাতটি দেশের মধ্যে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সাদৃশ্য অনেক। অর্থনীতির দিক দিয়ে প্রত্যেকটি দেশ পিছিয়েপড়া। তাই তারা নিজেদের মধ্যে নানা বিষয়ে সহযোগিতা বৃদ্ধির উদ্দ্যেশ্যে সার্ক গঠন করেছিল।

সার্কের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য –

1. অর্থনৈতিক উন্নতি, সামাজিক প্রগতি ও সাংস্কৃতিক বিকাশকে গতিশীল করা।
2. এই অঞ্চলের জনগণের জন্য এমন সুযোগ সৃষ্টি করা যাতে তারা নিজেদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং বিভিন্ন বিষয়ে সম্ভাবনাকে বিকশিত করতে পারে।
3. দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের কল্যাণ বৃদ্ধি করা ও জীবনযাত্রার মান যাতে উন্নত হয় সেদিকে নজর দেওয়া।
4. দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের মধ্যে যৌথ আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলা। এই আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলতে না পারলে বিদেশী আগ্রাসন ও নব্য উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা যাবে না।
5. পরস্পরের প্রতি আস্থা স্থাপন ও সমস্যা কে উপলব্ধি করা।
6. আর্থ – সামাজিক, সাংস্কৃতিক, কারিগরি ও বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে পারস্পারিক সাহায্য ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।
7. বিভিন্ন বিকাশশীল দেশের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।
8. আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।
9. শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতিকে অনুসরণ করা।

বলা হয়েছিল সার্কের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত দেশের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন হবে সাম্যভিত্তিক। সদস্যদের মধ্যে কোনরকম উচ্চ নীচ ভেদাভেদ থাকবে না। কোন সদস্য এই সংগঠনে বেশি গুরুত্ব পাবে না। এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না। সদস্যদের মধ্যে এমন আচরণ থাকবে না যার জন্য সংহতি বা ঐক্য বিনষ্ট হয়। সদস্যদের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করার জন্য দ্বিপাক্ষিক ও বহু পাক্ষিক আলোচনাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

সার্ক রাষ্ট্রসংঘের গুরুত্বকে অস্বীকার করেনি। রাষ্ট্রসংঘের আদর্শের সঙ্গে সার্কের আদর্শের কোন প্রভেদ ছিল না । রাষ্ট্র সংঘের মতো সার্কও মনে করে যে নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি না পেলে কোন বিকাশ সম্ভব হবে না। এই নীতি থেকে সরে আসার অর্থ বিকাশের গতি কে স্তব্ধ করে দেওয়া। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মতো সার্কও আরথ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক উন্নতির দিকে বেশি গুরুত্ব

দিয়েছিল। সার্কের সদস্যরা নিজেদের মধ্যে মতভেদ কে দূরে সরিয়ে রেখে ঐক্যবদ্ধ ভাবে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার উন্নতির দিকে নজর দিয়েছিল।

সার্ককে কিন্তু সামরিক মোর্চা বলা যায়না। সামরিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সার্ক গঠন করা হয়নি। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য এই সংস্থা গঠন করা হয়েছিল। বাস্তবে দেখা যায় যে অন্নেক উচ্চাশা নিয়ে সার্ক গঠিত হলেও সার্কের উদেশ্য যে পূর্ণ হয়েছে তা বলা যাবে না।

সার্কের সামনে থাকা সমস্যাগুলি হল -

1. জাতীয়তাবাদের প্রাধান্য সার্কের সদস্যদের মধ্যে বেশি থাকায় তারা আন্তর্জাতিকতাবাদকে বেশি গুরুত্ব দেয়নি। ফলস্বরূপ সার্কের কাজের অগ্রগতি ব্যাহত হয়।
2. সদস্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে রাজনৈতিক মতবিরোধ সার্কের শীর্ষ সম্মেলনে মাথা চাড়া দিয়ে উঠলে কোন বিষয়ে ঐক্য মতে পৌঁছান সম্ভব হয়নি। সার্ক কোন সময়ে একটি ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক সত্তা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি।
3. প্রতিবেশি রাষ্ট্রগুলির ভারত সম্পর্কে ভীতি আছে। ভৌগলিক দিক দিয়ে, জনসংখ্যার দিক দিয়ে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিকেও ভারত অন্য রাষ্ট্রের তুলনায় অধিক শক্তি শালী। স্বাভাবিক কারনে তাদের ভারত আতঙ্ক সার্কের সাফল্যে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে|
4. ভারত পাকিস্তান বিরোধ সার্কের সাফল্যের পিছনে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে।

সার্ক কে একেবারে ব্যর্থ সংগঠন বলা যাবে না। বেশ কিছু ক্ষেত্রে সার্কের ইতিবাচক দিক ছিল। সার্কের সদস্য রাষ্ট্রগুলি নিজেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝিকে আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে নিতে প্রচেষ্টা চালিয়ে ছিল। নেপালের কাঠমান্ডুতে সার্কের সচিবালয় স্থাপন করে উন্নয়নের কাজ কে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ, সন্ত্রাসবাদ দমনের জন্য কর্মসূচী প্রণয়ন, শিশু ও নারী কল্যাণ কর্মসূচী সার্ক গ্রহণ করেছে। সার্ক ধীরে ধীরে তার সমস্যা গুলোকে কাটিয়ে একটি ইতিবাচক সংস্থা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সমস্যার মাঝেও সার্ক কিন্তু তার প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি।